লিঙ্গভেদের অর্থ সমস্যা ঃ ‘রাগী’র স্ত্রী লিঙ্গ কি ‘রাগিণী’? ‘বরকর্তা’ থাকলে ‘বরগিন্নি’ দেখিনা কেন?

বিভাংশু দত্ত

বাংলায় এমন কিছু শব্দ আছে উভয় লিঙ্গে তারা সমার্থক হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে বিস্তর অর্থপার্থক্য। তেমনই কিছু শব্দ নিয়ে এ আলোচনা

শ্রীমান/শ্রীমতী ঃ বয়ঃকনিষ্ঠ বা কমবয়সিদের নামের আগে ‘শ্রীমান’ ব্যবহার করা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের নামের আগে ‘শ্রীমান’ বসানোর কোনও রেওয়াজই নেই। কিন্তু ‘শ্রীমতী’ ঠিক উলটো। ‘শ্রীমতী’ কদাচিৎ অল্পবয়স্কা বা অবিবাহিতার নামের আগে বসে। নামের আগে ‘শ্রীমতী’ দেখলে আমরা ধরে নিই নামটা হয় বিবাহিতা নয় কোনও বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর।

কুমার/কুমারী ঃ পাঁচ থেকে দশ বছর বয়স্ক বালককে ‘কুমার’ বলা হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে সতেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সি পুরুষকেও ‘কুমার’ বলা হয়। আবার ‘কুমার’ বলতে অবিবাহিত পুরুষকেও বোঝায়। আজীবন বিয়ে না করলে তাকে ‘চিরকুমার’ অভিধা দেওয়া হয়। ‘চিরকুমার সভা’ নামে রবীন্দ্রনাথের একটা জনপ্রিয় প্রহসনও আছে। বাস্তবে নামের ক্ষেত্রে কিন্তু ‘কুমার’ কখনই এমন অর্থ প্রকাশ করে না। তাই বিবাহিত পুরুষের নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা ওই ‘কুমার’ শব্দটা আক্ষরিক অর্থেই ‘চির কুমার’ হয়েই থেকে যায়। বিবাহিত উত্তমকুমার, অশোককুমার, দিলীপকুমাররা তো আছেনই, এমনকী চার চারটে বিয়ে করা সত্ত্বেও কিশোরকুমার ‘কুমার’ই থেকে গেলেন আমৃত্যু। উলটো দিক ‘কুমারী’ কিন্তু বিবাহিতাদের নামের আগে লেখা হয় না। আভিধানিক অর্থ মেনে ‘কুমারী’ শুধুমাত্র অবিবাহিতাদের জন্যই সীমাবদ্ধ।

সৎ/সতী ঃ বিবাহিত কি অবিবাহিত যে কোনও পুরুষের ক্ষেত্রেই ‘সৎ’ বিশেষণ ব্যবহার করা যায়। অন্য দিকে সাধ্বী পতিব্রতা নারীকেই ‘সতী’ বলা যায়। কুমারীকে ‘সতী’ বলা যায় না। আবার এ দুটো শব্দের ব্যবহারেও অসামঞ্জস্য আছে। ‘সৎ পুরুষ’ বলতে বুঝি যে পুরুষ প্রবঞ্চক বা অসৎ নন, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেন না। কিন্তু ‘সতী’ বলতে চারিত্রিক শুদ্ধতা বা পতিপরায়ণতাকে নির্দেশ করে। তাই, যখন কোনও বিবাহিতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলা হয় ‘সতীলক্ষ্মী’ হও মা’, তখন বধূটিকে পতিভক্তিতেই অবিচল থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়। এর বিপরীতটা কিন্তু ভয়ানক এবং অসম্মানজনক। কোনও পুরুষকে যদি বলা হয় ‘সৎ হও বাবা, সৎ হও’, এটাই মানে দাঁড়াবে পুরুষটি এতদিন অসৎ ছিলেন। এবার তাকে সৎপথে ফিরে আসতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

মাস্টারমশাই/দিদিমণি ঃ এখন অবশ্য শিক্ষককে ‘স্যার’ আর শিক্ষিকা ‘ম্যাডাম’ বা ‘ম্যাম’ বলা হয়। আগে বাংলা মাধ্যম স্কুলে শিক্ষককে ‘মাস্টারমশাই’ এবং শিক্ষিকাকে ‘দিদিমণি’ বলে সম্বোধন করা হত। এখনও এই সাবেক বাঙালি রীতি অনেক স্কুলেই চালু আছে। মজার ব্যাপার হল এই, শিক্ষিকারা চিরকালই দিদির স্তরে ‘দিদিমণি’ হয়েই থেকে যান। অবসর গ্রহণ করার পরেও নাতি নাতনির বয়সি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পক্ককেশী শিক্ষিকা সেই ‘দিদিমণি’ই রয়ে যান।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে এইভাবে পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দ পরিণত করার সময় আমার মনে কিছু মাজর প্রশ্ন জমা হয়েছে। দেখা যাক, লিঙ্গ পরিবর্তন করার ফলে সেগুলোর অর্থ কী দাঁড়ায়। ‘অনুরাগ’র স্ত্রীলিঙ্গ যদি ‘অনুরাগী’হয়, তবে ‘অনু’ উৎসর্গ বাদ দিলে ‘রাগী’র স্ত্রীলিঙ্গ কেন ‘রাগিণী’ হবে না? ‘পত্নী’ যদি ‘পতি’র স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে ‘সভাপতি’, ‘বিচারপতি’ লিঙ্গান্তরে ‘সভাপত্নী’, ‘বিচারপত্নী’ হবে নাই বা কেন? ব্যাকরণের নিয়মে তো সেটাই হয়। ‘কর্মকতা’ যদি হয়, ‘কর্মগিন্নি’ দেখি না কেন? বিয়েতে বরের সঙ্গে ‘বরকর্তা’ও আসেন, আবার বরকর্তার সঙ্গে যদি তাঁর স্ত্রী আসেন তখন তো আমরা তাঁকে ‘বরগিন্নি’ বলি না। ডাক্তারকে যদি ‘ডাক্তারবাবু’ বলি, তাহলে মহিলা ডাক্তারকে কী ডাকব ‘ডাক্তারগিন্নি’? অফিসের প্রধান করণিক বা হেড ক্লার্ককে ‘বড়বাবু’ বলা হয়। এই পদে যদি কোনও মহিলা বসেন, তিনি কি ‘বড়গিন্নি’ হবেন? ছিঃ ভাবতেই কেমন লজ্জা লাগে। অথচ ‘বাবু’র স্ত্রীলিঙ্গ দাদা-র স্ত্রী কি মা হয়? ভাবাটাই তো পাপ। কিন্তু ব্যাকরণে তো তাই বলছে। ঠাকুরদাদার স্ত্রী লিঙ্গ বা ঠাকুরদাদার স্ত্রী কী করে ঠাকুমা হল? ঠাকুরবৌদি বা ঠাকুরদিদি নয় কেন?

আমার পাপে

গৌতম মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছিলে
জোরে নয়, ঝিরঝির
ছাতার ওপরে তুমি নাচছিলে,
আমি দ্রুতপায়ে ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে চলেছি বেশ!
যেন এসব তোমার অনুরোধামৃত, মান অভিমান
সামান্য সামান্য অপমান!
ও আমি অগ্রাহ্য করে চলি সমানে।

আরও বেশ খানিকটা যেতে হবে
তোমাদের সহ্য করে— এ কথাও বলি অস্ফুটে।
তোমার কী সত্যিই অসহ্য হয় এইসব?
তুমি কী আর স্থির থাকতে না পেরে
আমার সামনে ঘটালে বিষম বজ্রপাত?
ধু ধু পুড়ছে সামনের নারকেল গাছ,
আহা ও কী দেষ করল?

সব পাপ তো আমার।

রঞ্জনা

সুনীল করণ

রূপনগরে ডুব দিত সে
দখিণ হাওয়ার মিষ্টি বাসে
পলাশ ফুলের রং ছড়িয়ে
করতো কাকে বন্দনা।

মনের পাখি হঠাৎ ডাকে
কী সে খোঁজে কখন কাকে
নিত্য ভোরের উদাস আলোয়
ডেকে ওঠে সে চন্দনা।

আমার এই দুখের দিনে
আসবে কি সে রাস্তা চিনে
যাবে রেখে চিহ্ন-স্মৃতি
মুছবে ভীরু গঞ্জনা?

কতদিন তো পার হলো
দেখা হলে তাকে বলো
আমি এখন আছি ভালো
ভালোবাসায় অন্ধ না।

সুখে থাকুক, ভালো থাকুক
ফুলের মতো রঞ্জনা

অদ্বিতীয়

প্রদীপ পাল

ব্যাকরণের পাতা ওলটাতে গিয়ে দেখি
পরস্পরবিরোধী শব্দের মুখোমুখি অবস্থান,
শব্দগুলি পরিপূরক একে অপরের।।

বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস
আলোর বিপরীতে অন্ধকার
রাতের বিপরীতে দিন
জীবনের বিপরীতে মৃত্যু।

এখানেই শেষ নয়...
বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আলো-অন্ধকার, রাত-দিন
জীবন-মৃত্যু, আশীর্বাদ-অভিশাপ,
জন্ম-জন্মান্তর শত কবিতা টিকে আছে—
শুধু সুখের কোনো বিপরীত বা যমজ শব্দের
খোঁজ পায়নি কবিরা।

নীল তিমি

তপন মুখোপাধ্যায়

সত্যি ভালবাসার অতলান্ত গহ্বরে
কে আর প্রবেশ করে বলো? খেলে যায়
শুধু মুখোশটুকু মেরুর দূরত্বে।
‘নীল তিমি’ই নিয়তি যেখানে
রামধনু নিংড়ে পাওয়া সাতরঙা রসের
শব্দহীন খেলায় কী লাভ সেখানে?
মানবভ্রান্তিজাত খেলনা ঘোড়ার বুকের
মাঝ থেকে এখন বেরয় না ট্রোজান
সৈন্যদল, বের হয় শুধু ছাই— নিঃশেষ
অন্তঃকরণ। সম্পর্কের নদীতে সাঁতার
কাটে দহন, জ্বলন আর বেদনা নিয়ে
পোড়া পোড়া শরীর প্রাকৃতিক নিয়মে,
না থাকে উত্তাপ, না গলন, না সমর্পন।
‘নীল তিমি’ অবাধে খেলে চলে তারুণিক পারাবারে।

নদী

প্রশান্ত মানিক

নদীটি তীক্ষ্ণ খরস্রোতা
ভালো লাগলে
তোমাকে বাসবেই
মানবে না প্রজ্ঞা ক্ষমতা।

নদীরা এমনিভাবেই ভালোবাসে
অনুরক্ত হলে
উজাড় করে নিজেকে।
হারিয়ে যেতে থাকে না মানা
নীল সমুদ্রের নোনা জলে।

স্বপ্ন হারায়

অনন্যা বালিয়াল

খেলনা আমার হারিয়ে গেছে
টেবিল জুড়ে বইয়ের রাশি
ছড়িয়ে আছে বিষণ্ণতায়
মিলিয়ে যাচ্ছে মুখের হাসি।

আমার নেই তো খেলার মাঠ
আমার নেই কো বায়না ধরা
এসব গেছে হারিয়ে আমার
আছে কেবল পড়া পড়া।

দাদু কই? ঠাম্মি কই?
কোথায় আমার কাকি কাকা
ফ্ল্যাটবাড়ির তিন তলাতে-
সারাটা দিন আমি একা।

দেখবে কখন, দেখবে কে আর
পড়া লিখছি খাতার পাতায়
স্বপ্নগুলোর ধরছি টুঁটি
আঁকছি শুধু ড্রয়িং খাতায়।

হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি

স্নিগ্ধা সেন

আশ্বিনের এক শারদপ্রাতে আলোর বেণু বাজিয়ে আসত আমাদের মহালয়া। মহালয়া তিথি তারিখ মেনে আজও আসে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় লাল দাগ দেখে আপ্লুত হই আমরা। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই না আমাদের সেই ছেলেবেলার মহালয়াকে। আমি যাটের দশকের গোড়ার দিকের কথা বলছি। শৈশবের হাত ছেড়েছি সবে। বালিকা বয়সের সারল্যে ভরা মনে এটুকু ধারণা হয়েছিল আর পাঁচটা দিনের চেয়ে এদিন একবারেই আলাদা। তবে যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মহালয়ার দিনের সূচনাটি বিশেষ হয়ে উঠত তা ছিল কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রসারিত ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’ গীতি আলেখ্য। এটাই ছিল আমাদেরও আগমণীর সকালের শুরু। আর গীতি আলেখ্যই ছিল আপামর বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ। ভোরে ঘড়ির এ্যালার্ম বাজলেই মা ডেকে দিত আমাদের দু'বোনকে, আর আমরাও বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুয়ে বসে পড়তাম রেডিওর সামনে। বাংলা-বিহার সীমান্তের শিল্পনগরী বার্ণপুরে আশ্বিনের শিশির ধোয়া ভোরে থাকত শীতের আমেজ। আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শুরু হতেই বাতাসের শিরশিরিনি ছড়িয়ে পড়ত মনে। সেদিনটায় অনুমতি ছিল চা পানের। সেও ছিল এক পরম প্রাপ্তি। কাঙ্খিত সেই অনুষ্ঠান শুরু হলে বর্ণসজ্জায় সজ্জিতা মা দুর্গার সাথে আমরাও পৌঁছে যেতাম সেই অলৌকিক রণাঙ্গণে। আমাদের মার হাতে দুষ্টু অসুরের নিধন ভারি তৃপ্তি দিত। কিছু বুঝে বেশিটাই না বুঝে শুনতে থাকতাম মহালয়া। সবশেষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠের মাতৃবন্দনায় কী এক অজানা আবেগে ভিজে উঠত আমাদেরও চোখের পাতা।

সকাল হত ভেজা শিউলির গন্ধ নিয়ে। আমাদের টাউনশিপের সার সার রাস্তার নাম ছিল না, ছিল শুধু নম্বর। আমরা থাকতাম ১৬নং রোডে। রাস্তার দুপাশের প্রায় প্রতিটি কোয়ার্টারের বাগানে ছিল শিউলি গাছ। বাবা ডাক্তার হওয়ার সুবাদে পাশাপাশি সব বাড়িতেই ছিল ফুল কুড়োনোর ঢালাও অনুমতি। আমার একমাত্র প্রিয় বান্ধবী কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ত। শুরু হত শিউলি ফুল কুড়োনো। এই কাজ রোজই করতাম। কিন্তু মহালয়ার দিনটাতে তা যেন উৎসবে পরিণত হত। ফুলতোলা শেষ হতেই আমরা দুজনে আমাদের শাল, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিরীষ আর জারুল গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম কিছুদূরের মাঠে। আমাদের পছন্দের পাথরে বসে সদ্য ওঠা সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাত ধরে শপথ নিতাম, প্রতিবার এইভাবেই মহালয়া উদ্‌যাপনের। কালের অমোঘ নিয়মে সেইসব ছেলেমানুষি প্রতিশ্রুতি ধুয়ে মুছে গেছে। রয়ে গেছে শুধু কিছু স্মৃতি যা আজও প্রতি মহালয়ায় মনে পড়ায় তার সুন্দর মুখখানি। রোদের তেজ একটু বাড়তেই যে যার বাড়ির পথ ধরতাম। বাড়ি ফিরে শুরু হত এক অন্য অপেক্ষা। সে অপেক্ষা পেপার কাকুর জন্য। কারণ তখন সব পুজো সংখ্যাই প্রকাশিত হত মহালয়ায়। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটত মনটা কখন আসবে পুজোবার্ষিকী। শুকতারা আর দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত মোটাসোটা বইটি। প্রতিবছর যার সুন্দর সুন্দর নাম থাকত। মহালয়ার বিশেষ প্রাতরাশ লুচি, আলুরদম আর মিষ্টির সদ্ব্যবহার করতে করতে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম নতুন পুজো সংখ্যায় যতক্ষণ না মা এসে স্নানের জন্য তাগাদা দিত। দুপুরে খাওয়ার তালিকাটাও প্রতিদিনের চেয়ে অন্যরকম হত। সব কিছুর সাথে অবশ্যই থাকত মায়ের হাতের দইমাছ (যা মা অসাধারণ রাঁধত) আর খাসির মাংস। খাওয়ার পর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ভান করে অন্ধকার ঘরে জানলার পর্দা ফাঁক করে সেই আলোতে চলত বইপড়া। তার মধ্যে নিয়ম না মানার অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর আনন্দ ছিল। ভাবলে দুঃখ হয়, বই-এর সমুদ্রে ডুব দেবার অপার্থিব আনন্দ থেকে আজকের প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই বঞ্চিত। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হত। সন্ধের জন্য থাকত অন্য উত্তেজনা। বাবার দুই বন্ধু ও বন্ধুপত্নী যাঁরা আমার নিজের কাকু-কাকিমাই ছিলেন তাঁরা আসতেন ওই নির্দিষ্ট দিনটিতেই। হাতে থাকত আমাদের দু'বোনের জন্য নতুন জামা। কী যে ভাল লাগত সেই উপহার পেয়ে। ফি বছর পাওয়া এই উপহার নতুন আনন্দে ভরিয়ে দিত মন। অনেকক্ষণ হৈচৈ-খাওয়া-দাওয়ার পর এক কাকুর অস্টিন গাড়িটাতে আমরা ছোটরা ঠাসাঠাসি করে বসতাম আর কাকু আমাদের গাড়িতে গোটা টাউনটা এক চক্কর ঘুরিয়ে প্যাণ্ডেলে বাঁশ বাঁধা দেখে আলোচনা করতাম মা দুর্গাতো এসেই গেছেন। ওরা চলে যেতেই সাঙ্গ হত আমাদের মহালয়া। শুধু রয়ে যেত তার রেশটুকু। অনুষ্ঠান শুরুর আগে যেমন পর্দা উত্তোলন হয় মহালয়ার ভোরে সেই আগমণীর আলোই ছিল আমাদের শারদোৎসবের ‘কার্টেন রেজার’।

আস্তে আস্তে বাল্য, কৈশোর পার করে সদ্য পাওয়া যৌবনেও ছিল মহালয়া। কিন্তু ক্রমশঃ ফিকে হতে থাকল তার রং, রূপ তাৎপর্য সবই। এখনের মতো মহালয়া থেকেই প্যাণ্ডেলে প্রতিমা আসার ধূম ছিল না। আমরা কান পেতে থাকতাম কখন ষষ্ঠীর ভোরে মার বোধনের পর ঢাকে কাঠি পড়বে আর শুরু হবে আমাদের পুজো। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মত মহালয়া থেকেই শুরু হত সেই শুভক্ষণ। মহালয়া তর্পণের দিন। গুরুজনদের ভক্তিবিনম্র চেহারা সমীহ জাগাত মনে। ‘অব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্তং’ এই মন্ত্রোচ্চারণে পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করা হত। বড়ো হয়ে জেনেছি তর্পণ আত্মীয়, অনাত্মীয়, দুঃস্থ, অনাথ অর্থাৎ বিশ্বজগতের পরলোকগত সমস্ত আত্মার শান্তি কামনা। আমাদের ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাবনায় মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের দ্রুত বদলে যাওয়া যাপনচিত্রে সর্ব অর্থেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল মহালয়া। আজ আমার শিউলিফুল নেই। আমার সাংসারিক কাজের সাহায্যকারিনী মেয়েটি আমাকে এখন এনে দেয় শিউলি ফুল। সেই রূপ সেই গন্ধ একই আছে, শুধু বদলে গেছে প্রেক্ষাপট। এখন আমার কাছে মহালয়া মানে ফেলে আসা বাল্য, কৈশোর আর পুরোনো এ্যালবামের হলদে হয়ে যাওয়া পিতৃপুরুষের স্মৃতি।

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হেলথ্ কেয়ার প্রাঃ লিঃ
পি.সি.সেন মার্কেট, দ্বিতল, লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলী
ফোন ঃ ০৩২১১-২৫৫৮৬৭/২৫৬৮৬৭/৯০৯৩৯৬৫৮৩৮

অ্যানাস্থেজিলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও পেন ম্যানেজমেন্ট
ডাঃ মাজারুল ইসলাম, এম.বি.বি.এস, এম.ডি (ক্যাল)
যুক্ত- আরামবাগ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা
কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ
ডাঃ প্রিয়ম মুখার্জী, এম.বি.বি.এস, এম.ডি ডি.এম (কার্ডিও)
যুক্ত-ফর্টিস হসপিটাল (কলকাতা)
শিশু ও নবজাতকদের ইকোকার্ডিওগ্রাফী করেন)।
সময়- প্রতি মাসের ১ম ও ৩য় মঙ্গলবার বেলা ১২টা।
সার্জেন- ডাঃ কঙ্কন চট্টোপাধ্যায়,
এম.বি.বি.এস, ডিজি.ও, এম.এস. (ক্যাল)
জেনারেল সার্জেন ও ল্যাপরোস্কপিক সার্জেন
সময়- প্রতি মঙ্গলবার, শুক্র ও রবিবার বিকাল
ইউরোলজিস্ট - ডাঃ রঞ্জনকুমার দে,
এম.বি.বি.এস, এম.ডি , এম.এস., এম.সি.এইচ(ইউরো)
যুক্ত- আর জি কর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
সময় - প্রতি ১৫দিন অন্তর রবিবার।
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ- ডাঃ সমরাজ মুখার্জী
এম.বি.বি.এস, এম.ডি. (সাইক্রিয়াটিস্)
যুক্ত- কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল, সময়- শনি ও রবিবার
নাক,কান,গলা রোগ বিশেষজ্ঞ-
ডাঃ কাজী আবেদুর রহমান
এম.বি.বি.এস, এম.ডি , এম.এস. (ই.এন.টি)
যুক্ত- ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল)
সময়- প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

অস্থি বিশেষজ্ঞ-
ডাঃ চিরজিৎ দে, এম.বি.বি.এস, এম.এস (অর্থো),
এম.আর.সি.এস(ইংল্যান্ড), ইউ.কে
সময়- প্রতিদিন (শনিবার বাদে)
স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শুদ্ধশ্রী মণ্ডল, এম.বি.বি.এস, এম.এস, (জি.এণ্ড ও.)
যুক্ত- আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল
সময়- সোমবার থেকে শুক্রবার বিকাল।
ডাঃ শান্তনু অধিকারী,
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (জি. এণ্ড ও.)
যুক্ত-ঘাটাল মহকুমা হসপিটাল, সময়- বুধ থেকে রবিবার সকাল
ডাঃ সুরজিতা মাজী, এম.বি.বি.এস, এম.এস. (জি এণ্ড ও)
যুক্ত- বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
সময়- শনি রবিবার সকাল ১০টা
নিউরোলজি-
ডাঃ বরুণ কুমার সেন এম.ডি(মেডিসিন),
ডি.এম (নিউরো) যুক্ত- বাঙ্গুর হসপিটাল কলিকাতা, প্রতি শনিবার
কার্ডিয়াক সার্জেন এণ্ড নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট
ডাঃ অর্ণব মাইতি, এম.বি.বি.এস, এম.এস, ডি.পি.এম.,
এম.সি.এইচ(সি.টি.ভি.এস) যুক্ত- পি.জি হসপিটাল, কোলকাতা
১৫দিন অন্তর রবিবার।
গ্যাস্ট্রোলজি বিশেষজ্ঞ-
ডাঃ পিনাকী রায়,
এম.বি.বি.এস, এম.ডি , ডি.এম (গ্যাস্ট্রো) প্রতি রবিবার
যুক্ত- এন আর এস, মেডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটাল

এখানে সমস্ত রকমের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া, ওষুধ নেওয়া এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমস্ত রকমের ডায়াগনষ্টিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নার্সিং হোমের সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।(অর্থপেডিক সার্জারী, ল্যাপরোস্কপিক সার্জারী, ইউএরা সার্জারী এবং পেস মেকার বসানো হয়)